ঢাকার সংস্কারে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

ঐতিহাসিক মতে ঢাকার নগরায়ণ শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। কথিত আছে যে সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গালে দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ তিনি ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় ছিল তাই তিনি মন্দিরের নামকরণ করেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। কালক্রমে ঢাকেশ্বরী থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবাহ বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের বহি:প্রকাশ স্বরূপ শহরে ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনি লোকমুখে কিংবদন্তীর রূপ নেয় এবং তা থেকেই শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকা বেশ কিছুদিন জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ঢাকাকে সুবাহ বাংলার রাজধানী ঘোষণার মাধ্যমে ১৬১০ সালে ঢাকা প্রথম রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনামলে আধুনিক ঢাকা শহরের বিকাশ ঘটে। তখন এ অঞ্চল শাসন করতেন নবাবরা। এ সময় কলকাতার পরেই ঢাকা বাংলা প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর হয়ে উঠে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী হয়। ১৯০৫-৬০ সালের মধ্যে এই শহর বিভিন্ন সামাজিক, জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় যা ১৯৭২ সালে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫ (ক) তে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি পায়।

ঢাকার নগরায়ণ খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শুরু হলেও রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতির পর এর নগরায়ণ ও উন্নয়ন নতুন মাত্রা পায়। বর্তমান দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। বর্তমানে এ শহরের লোকসংখ্যা আড়াই কোটিরও বেশী। কাচা, সেমিপাকা, পাকা ও বহুতল ভবন মিলে বর্তমানে ঢাকায় ২২ লাখেরও বেশি ভবন রয়েছে। সাভার, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও অন্যান্য এলাকা মিলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ৯০ বর্গমাইল বা ১৩২৮ বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি। এই বিশাল এলাকায় উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ একটি দুরূহ ও জটিল প্রক্রিয়া। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ছাড়াও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঢাকায় বাসযোগ্যতা বজায় রাখা ও এর পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, কলকারখানা, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হওয়ায় এবং জীবন জীবিকা সহজলভ্য হওয়ায় মানুষ শহরমুখী। ফলে প্রতিনিয়ত শহরের লোকসংখ্যা বাড়ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদাসমূহ বিশেষ করে বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা ক্রমান্বয়ে দুরূহ হয়ে পড়ছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপ সামলাতে নিত্য নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন পড়ছে। ফলে শহরে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল রাস্তাঘাট আরো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। উপরন্তু অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে দোকানপাট সাজানো, যত্রতত্র পার্কিং, ভাসমান দোকানপাট, অপরিকল্পিত স্থাপনা ইত্যাদি শহরের বাসযোগ্যতাকে আরো সংকুচিত করছে দিনের পর দিন। ১৯৫৩ সালে প্রণীত The Town Improvement Act, 1953 (East Bengal Act) Act No. of 1953 আইনের আওতায় ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও পরিবর্ধনের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে গঠন করা হয় Dhaka Improvement Trust. পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে উক্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে DIT কে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কাজ মূলত রাজধানী ঢাকা ও এর সন্নিহিত এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ঢাকার বাসযোগ্যতা বজায় রাখা। উল্লেখ্য যে DIT প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঢাকার উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল না। ফলে যত্রতত্র স্থাপনা নির্মাণ, অপরিকল্পিত অবকাঠামো ও সমন্বয়হীন উন্নয়ন কাজ হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। অত্যন্ত পরিতাপে বিষয় যে ঢাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন ও বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য গঠিত DIT ও বর্তমান রাজউক বিশাল ব্যয়, বহু জনবল ও অক্লান্ত শ্রম দিয়ে সফল হতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতি, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কর্তব্যকর্মে চরম

অবহেলার কারণে তাদের সকল উদ্যোগ প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। উপরন্তু শহরের বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সামলানো ও নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে প্রায়ই অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে দেখা গেছে প্রতিষ্ঠানটিকে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। বর্তমানে ঢাকা শহরে সুপরিসর ফুটপাত থাকলেও পথচারীদের হাঁটার জো নেই। অবৈধ দখল ও ভাসমান দোকানপাট ফুটপাথ উপচে অনেক ক্ষেত্রে চলে এসেছে প্রধান সড়কে। যত্রতত্র বসছে সবজি ও ফলের দোকান। এখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং চলাচলের রাস্তাকে করছে সংকুচিত। অনুমোদনবিহীন ভবন নির্মাণের ফলে বাড়ছে অগ্নিঝুঁকি ও ভবন ধ্বসের ঝুঁকি। মাত্রাতিরিক্ত ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল, জীবাশ্ম জ্বালানি দহন ও বর্জ্যের আধিক্যের কারণে বাতাসে বাড়ছে সিসা, কার্বন , মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থ।

যানবাহন ও কলকারখানার শব্দে অতিষ্ঠ নগরজীবন। যেখানে সেখানে বিলবোর্ড, আলোকসজ্জার কারণে একদিকে হচ্ছে বিদ্যুতের অপচয়, অন্যদিকে আলোক দূষণ। ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড ও শহরের জন্য মাস্টারপ্ল্যান না মানায় গড়ে উঠছে জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র স্থাপনা। ফলে যথেষ্ট আর্থিক সংগতি থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনযাত্রার মান হচ্ছে নিম্নমুখী। শহরের সক্ষম প্রত্যেকটি নাগরিক নিয়মিত পয়ঃনিষ্কাশন কর পরিশোধ করলেও ঢাকার দশ শতাংশেরও কম ভবনে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে। এব্যপারে সিটি কর্পোরেশন প্রায়ই ভবন মালিকদের নিজস্ব উদ্যোগে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ দিচ্ছে। ভবন মালিক নিজেই যদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে তবে সিটি কর্পোরেশনের পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কর আরোপের যৌক্তিকতা নেই। এই একটি বিষয়ের দ্বারাই সিটি কর্পোরেশনের ব্যর্থতার পরিমাপ করা যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঢাকার দূষণ রোধ ও বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হলেও তাদের গাফিলতি ও প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও কর্তব্যকর্মে অবহেলার কারণে ঢাকা আজ পৃথিবীর অন্যতম দূষিত, অপরিকল্পিত ও ঘনবসতিপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছে। আর এর পিছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ।

৫ আগস্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করলে দেশের সকল সেক্টরে সংস্কারের দাবি উঠে। সরকার এসব দাবি পূরণে আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের উদ্দেশ্যে একাধিক কমিশন গঠন করা হয়েছে। সেই সাথে দেশের আবাসন খাতের উন্নয়ন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ সকল শহর ও নগরের বাসযোগ্যতা বজায় রাখা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে আলাদা একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে শহরের ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা উচ্ছেদ, অবৈধ দখলদারিত্বের অবসান ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন রাজধানীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। এজন্য ঢাকার হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি পল্লী যেভাবে সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে সেভাবে ঢাকার অভ্যন্তর হতে গার্মেন্টসসহ সকল শিল্প কারখানা অপসারণ করে রাজধানীর পেরিফেরি এলাকায় অকৃষি জমিতে এসব কলকারখানা স্থানান্তর করা যেতে পারে।

একই সাথে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল/কলেজ ঢাকার বাইরে তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করতে হবে। রাজধানীর সকল ভাসমান দোকান অপসারণ করতে হবে, ফুটপাতের দখলদার উচ্ছেদ ও সকল সরকারি জমি উদ্ধার করে দখলদারদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্থানান্তর করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। মফস্বল এলাকায় আধুনিক চিকিৎসাসেবা (সরকারি ও বেসরকারি) সম্প্রসারণে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারি পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানান্তর করতে হবে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে উচ্চ আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে হবে। এতে রাজধানী ঢাকায় মানুষের যাতায়াত হ্রাস পাবে। রাজধানীর ভিতর হতে দূরপাল্লার বাস চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে শহরের সন্নিহিত এলাকায় টার্মিনাল স্থানান্তর করতে হবে। সুনির্দিষ্ট কারণ ও উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া রাজধানীতে বসবাসে কড়াকড়ি আরোপ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা। ফলে সমগ্র দেশের মানুষই ঢাকামুখী। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এবং দূষণের শহরও ঢাকা। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে এখানে বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা অপ্রতুল। রাস্তায় যানজট এখানকার মানুষের নিত্য সঙ্গী। ঢাকার বর্তমান যানবাহনের গড় গতি ৬-৭ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টা যা একজন সুস্থ মানুষের পায়ে হেঁটে চলার গতির প্রায় সমান। এখানে জীবনযাত্রার ব্যয় দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অত্যধিক বেশি। মানুষের আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করতে হয় বাসস্থানের সংস্থান করতে। অগ্নিদুর্ঘটনা, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগের ঝুঁকিও এখানে অত্যধিক বেশি। এক কথায় বলতে গেলে এখানে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা খুবই কঠিন, দুর্বিষহ ও ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ কয়েকটি বড় সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে ঢাকা হতে পারে বিশ্বের অন্যতম সৌন্দর্যমন্ডিত তিলোত্তমা নগরী। ঢাকা ছাড়াও দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুরসহ দেশের সকল শহর ও নগর বন্দরের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য দরকার যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন রাজনৈতিক সরকারের জন্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। কারণ বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান সাময়িক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এতে রাজনৈতিক সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ স্থানিক বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা ভোটের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে রাজনৈতিক সরকার এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেহেতু ভোটের রাজনীতির সাথে যুক্ত নয় স্থানিক বাধা এবং ভোটের রাজনীতির প্রভাব তাদের চিন্তার বিষয় নয়। ফলে এ ধরনের জনকল্যাণমুখী দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য সহজতর। তাই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়।

#

পিআইডি ফিচার